একক ৪৫ ☐ হুতোমপ্যাঁচার নক্‌সা ঃ চড়ক—কালীপ্রসন্ন সিংহ

গঠন

৪৫.১ উদ্দেশ্য
৪৫.২ প্রস্তাবনা
৪৫.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪৫.৪ মূলপাঠ—হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা ঃ চড়ক—বিশ্লেষণী পাঠ
৪৫.৫ সারাংশ
৪৫.৬ অনুশীলনী
৪৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪৫.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করে পাঠক ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল ধারণা করতে পারবেন।
- কালীপ্রসন্ন সিংহের বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্বন্ধেও পাঠক অবহিত হবেন।
- তৎকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে আজকের সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক ধারণায় উপনীত হবেন।

৪৫.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব হল। প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। সাধারণত প্রবন্ধ সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তামূলক ও তত্ত্বমূলক গদ্য রচিত হয়।

প্রবন্ধ সাহিত্যের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১) প্রবন্ধ সাহিত্য গদ্যে লেখা হলেও তা রস সাহিত্য নয়। মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্বই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

২) আবেগ ও কল্পনার কোনো স্থান প্রবন্ধে নেই।

৩) কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এখানে লেখকের নিজের ভাবনা চিন্তার কোনো গুরুত্ব নেই।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সাথে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেরী সাহেবের 'দিগদর্শন' পত্রিকাটি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদান, তাই প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ ও (২) মন্ময় বা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ।

বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয় গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি তর্ক, তত্ত্ব তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট

বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তত্ত্ব, তথ্য জ্ঞান ইত্যাদি এ জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। ফরাসি প্রাবন্ধিক মঁতায়েন প্রথম এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেন। রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর Essays of Elia'-র প্রবন্ধগুলিতে আত্মপ্রক্ষেপময়, সরসতা ও বিষণ্ণতার আশ্চর্য মিশ্রণে উজ্জ্বল এক জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' আত্মগৌরবী প্রবন্ধের স্মরণীয় উদাহরণ।

রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত নিবন্ধ একই গোত্রভুক্ত সাহিত্য, তবে এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ টানা যায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতো রম্যরচনায় থাকে রমণীয়তা, খেয়ালি কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং তথ্যভাবের পরিবর্তে রচনারস সম্ভোগের আস্বাদ্যমানতা। তবে রম্যরচনাকে ব্যক্তিগত হতেই হবে, এমন নয়, তা বস্তুগত কোনো অবলম্বনকে উপলক্ষ করেও রচিত হতে পারে। যে গদ্য রচনায় জীবনের লঘু চপল দিকগুলি নিয়ে উচ্চতর সারস্বত কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে রম্যরচনা বলা হয়। চিত্তের ক্ষণ প্রকাশ রুচির উন্নত প্রকাশ, সংযত ভাবাবেগ প্রভৃতি তাই রম্যরচনার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। রম্যরচনা প্রসঙ্গে ড. জনসনের বহুল প্রচারিত উক্তি—

"...loose sally of mind which is an irregular undigested piece and not regular or orderly composition."

প্রবন্ধে রচয়িতার মেধা ও বুদ্ধির ছাপ পড়ে, কিন্তু রম্যরচনায় রচয়িতার হৃদয়ের পরিচয় ছড়িয়ে থাকে। গল্প, নাটক বা উপন্যাসের সঙ্গেও রম্যরচনার পার্থক্য আছে ; কারণ ঐ সাহিত্য বিভাগগুলিতে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী বৃত্ত থাকে, যার থাকে একটি নির্দিষ্ট সূচনা, শীর্ষবিন্দু ও সমাপ্তি ; যা রম্যরচনায় থাকে না। কবিতাও রমণীয়, কিন্তু কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক থাকে ; যা রম্যরচনায় থাকেনা। রম্যরচনায় বক্তা ও শ্রোতা অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু, সেখানে তাই থাকে এক বৈঠকী মেজাজের আড্ডা প্রবণতা। রচয়িতা এখানে পাঠককে তত্ত্ব আর তথ্যের ভারে অভিজ্ঞ করতে আসেন না বরং জীবন ও জগতের বৈষম্য বিষয়ে কিছু কটাক্ষপাত করে থাকেন বা কিছু 'বাজে কথা' বলে থাকেন। বন্ধুর সেই উচ্চারণে ধার থাকলেও ভার থাকে না। বাজে খরচের মতো বাজে কথাতেই তিনি সম্পূর্ণ ধরা দেন ; এখানেই রম্যরচনার আসল ব্যক্তিগত রসের প্রকাশ।

রম্যরচনার কোনো বাঁধাধরা রচনারীতি নেই। জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে তা লেখা হতে পারে। তবে রম্যরচনায় রসিকতার স্থলে স্থূলতা বা ব্যক্তিগত সুরের স্থলে অহমিকা প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত নয়। বর্তমান কালের জটিল জীবনে অপসৃয়মান যে অবসরটুকু আমরা পাই তাতে রম্যরচনা পাঠ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর তাই রচয়িতাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনো আতিশয্য, পুনরুক্তি, আমিত্ব, স্থূলতা-র প্রকাশ এর রসাবেদন সৃষ্টিতে যেন বাধা না আনে। ভঙ্গিসর্বস্ব রম্যরচনা লেখকদের সম্পর্কেই বুদ্ধদেব বসু এহেন সরল মন্তব্যটি করেছিলেন—"যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য.....তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না রম্যরচনা শব্দটির সৃষ্টি হত।"

বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা ইউরোপীয় প্রভাবজ। ডি, কুইন্সির Confessions of an English Opium Eater-এর অণুপ্রেরণায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা-ই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও স্থান পাবার যোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'তে এর প্রাথমিক উপাদান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলি, বুদ্ধদেব বসু, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখেরা বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সাবধান বাণীটি মনে রেখেও বলা চলে সাম্প্রতিক বাংলা রম্যরচনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তর অতটা আতঙ্কিত বা নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কারণ বোধহয় এখনো আসেনি।

প্রথম এককটিতে প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" গ্রন্থের "চড়ক" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

আপনি এই এককটি পড়লে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে যেমন ধারণা পাবেন, তেমনি হুতোমের ভাষা সম্পর্কেও ধারণা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি এককটিতে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"-র সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত রম্যরচনার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

৪৫.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দু বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে (নন্দলাল সিংহ) তাঁর প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাবক ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হরচন্দ্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বালক কালীপ্রসন্নের শিক্ষালাভ ও প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্ন বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব না দেখালেও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে ও পারে স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ বিদ্যার্জন করেছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও আড়ম্বরহীনতা বাল্যজীবনেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, রঙ্গামঞ্চ স্থাপন, সংবাদপত্র পরিচালন, সমাজসংস্কার, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল কর্মমুখর। বিচারপতি হিসেবেও তিনি ছিলেন দক্ষ। সাধ্যের অতিরিক্ত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি শেষ জীবনে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার চার বছর পরে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

৪৫.৪ মূলপাঠ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" ঃ চড়ক

কলিকাতায় চড়ক পার্ব্বন

"কহই টুনোয়া————————
সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি————————টুনোয়ার টম্পা।

———————

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিত! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে - দুষিবে জগৎ - হাঁসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভয়রায়ে কাঁদিবে
কুমার সে সময় মনে য্যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ সাল। কলকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, ও চড়কির পিঠ সড় সড় কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বাঁটি প্রস্তুত কচ্চে,—সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ের নূপুর, মাথায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসী হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড়মানুষ

বলতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে, বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ বাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে। আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আক্ষরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নুপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীর-ব্রতের মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গাতে নেচে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘন্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী করে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে, কখন বলে "ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গো যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে ; কখন ঢাকের পেছনটা দুম দুম করে বাজাচ্চে-বাম মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যয়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুঠো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকেত ধুঁকেত বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো ; সে নিজে কাওয়া হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কর কল্লেন, মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, বাবা তটস্থ !

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গো নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো ; পাছে লোকে জানতে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সইস-কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, বিবিজানের সঙ্গো একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ !—কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাধা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগ হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিট্‌চ্চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি হবে। বাড়ীর ভিতরে খবর গেলো ; গিন্নিরা পরস্পর বিষন্ন বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাকবে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এইসব হয়" এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে ; অবশেষে গুরু পুরুত ও গিন্নীর ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয় বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান ! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজগোজ সমতেই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমুহ বিপদ মনে করে বিষন্ন বদনে বাবুর পেচোনো পেচোনে যেতে লাগলো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র ক'রে ফুলের

মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন ; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, ফুল দাও', বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে একঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরতে লাগলো, আধঘন্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে একবোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো "না হবে কেন—কেমন বংশ !"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আনলে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো ; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে ব'সে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ ! "শিবের কি মাহাত্ম্য" ! কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু'একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জানতে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—"গিন্নীরা বলে দিয়েচেন—"ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুম যে, ধরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘন্টার শব্দ থামেলো। সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই' ! চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো ; সে সময় ইংরেজি জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরেজি কথার ফর্‌রার সঙ্গো খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্চেন। এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগছির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তারে চিনতে পারবে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেশে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্থ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়চে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে, স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোনার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গাম্‌চাকাঁধে, ভাল মাচ নিবে" ? "ও খেংরা গুপো মিন্সি, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বর শিবো।" চীৎকার হতে লাগলো, গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল-সন্ন্যাস। বাড়ীর সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে ; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতালায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো। ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাসী সমাপন হলো ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজাতে লাগলো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে ; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গ্যালো।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন ; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারদিকে চার পাঁচজন হাস্‌চে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে ; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর ; ওদের মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা ; ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতপায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো। মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রী হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকারে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলায়র বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না," "পালেদের একধামা পেতলের বাসন গেছে' ও গন্ধবেণেদের সর্বনাশ হয়েছে।" আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি সন্ন্যাসীরা হর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখো হচ্চে। উড়ে বামুনেরা ময়দানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারান্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে ; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর কেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে ; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,—"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা" "মাগী যে জক্কী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের তার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন। সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়া ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গম্ গম্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দবনি ও ক্যারামত জাহির করবেন সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর, কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেন্ড নিয়তই কাচে থাকে, হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেকটর মহলে একাদশ বৃহস্পতি।

গুপুস ক'রে তোপ প'ড়ে গ্যালো। কাকগুলো কা কা ক'রে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের বেগুন বাজরা আস্‌চে, দিঁশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছিলেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি ক'রে নেছেন ; কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাকটিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের ওষুধ চমৎকার ; কেউ মতন রোগীর নাক ফুড়ে আরাম করেন ; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে—সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এককাটি সরেশ ; সকল রোগেই সদ্য মৃত্যুশর ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও কর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরা কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেচে, আজ বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারার দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিকস, একসচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায়—হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ দেখা না হলে গ্রাহকেরা পান না ইংরেজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের

সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলী হলো, পাগড়ী বাঁধা প্রথম ইনষ্টলমেন্টে শিপ সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পারমাণবিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেন্টের অফিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেতাম না। আজকাল ইংরেজী লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানারকম বেশ ধরে অফিসে যান—পাগড়ী প্রায় উঠে গ্যাল দুই একজন সেকেল কেরাণীই চিরপরিচিত পাগড়ীর মান রেখেচেন ; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায়ট পাগড়ী দেখতে পাব না ; পাগড়ী মাথায় দিলে আলবার্ট ফেশনের বাঁকা সিঁথেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ী প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে ? হাতে কাজ কিছু নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা, বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে," কার বাগানের দরকার, "কে টাকা ধার করবে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবু দালাল চাকর থাকেন ; দালালেরা শিরা ধ'রে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন।

দালালী কাজটা ভাল "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী -ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায়। অনেকে "রেস্তহীন মুচ্ছদী" চারবার "ইন্সালভেষ্ট" নিয়ে এখন দালালী অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন এঁরা বর্ণচোরা আঁক এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই পসাদার চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান সাড়া দেন, সুতরাং মনে মত কোটাল হলেঁ চুলেনাপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতো, শোনা, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একেবারে মোরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সুখের দলের পাঁচালী ও হাপ আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্জ্জনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজন দেখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন ; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন ; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজোপিস বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেক চড়ক, বাণ ফোঁড়া তলোয়ার ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পোঁত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপী, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না ; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়া-গাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁতকে পড়েন ; ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান ; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা ; দেখলেই চেনা যায় ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার

বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা ! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধ্যে খুনী মামলায় গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজেগুজে গাড়ী চলে বেড়ান।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতার এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা ক'রেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না। তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্যা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশ ঘন্টা সোনাগাছিতেই কাটান। লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন ; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যাটা, খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপীড়ি হলে দেশে স'রে পড়েন—সেথায় রামরাজ্য !

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই দালাল পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজদ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম -বালির ব্রিজ, বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদ যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালার এজেন্টি কর্ম্মে মক্‌রর হয়।

আজকাল সহরে ইংরেজি কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন ; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্টদ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ" ; প্রথম দলের সকলি ইংরেজী কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া, হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্‌স সামনে থাকে, পলিটিক্‌স ও 'বেষ্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মত খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবার হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে ; এঁরাই ওল্ডা ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে বাগম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক বাঘের চেয়ে হিংস্র বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ-সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড়লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনারক বেশি দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন-চারিটি "ইকুটি", দুটি "কমন লা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উটনোওয়ালা মহাজন খাতা বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন', 'ওয়ারিন', 'উকিলের চিঠি' ও সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছল না মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা" অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন ; কিন্তু কিছুতেই শান্তি-লাভ করতে পাচ্চেন না।

কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুড়ীর মত ঘুরচেন। পরশুদিন "বউ বউ", "লুকোচুরি", "ঘোড়াঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বসতে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত ! ছেলের হাতে ফল দেখলে

কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার ;—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু", কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, "উমেদার", কন্যাদায় (হয়ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটেছেন, আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা রয়েছে, সময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে ভরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর ; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায় ; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই ঃ রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল সেক্‌সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে তেলী, ঢাকাই কামার আর ফরারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সূর্ব্বন চৌকীদারের মত পোষাক—পেনটুলেন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রিস্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয়ে যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুঠে পাঠশানের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রিস্টান হতো ; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রিস্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রিস্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে সাদা হয়—ধুলোয় ধুলো ; তার মধ্যে চাকের—গাজন বেরিয়েছে। প্রথম দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে বাজাতে চলেছে—তার পেচোনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণি। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গাতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হর্‌করা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপী মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলছে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে ছোট ভাই—পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন—তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, টাক লাল টকটক্ কচ্চে মাথা ভবানীপুরে, কালীঘেটে ধুলোয় ভ'রে রয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেঁপচ্ছে হুড়মুড় করে কেউ দোকালে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চলে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখে যুবকযুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্টকালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের চারিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন—যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা—কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে,—আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল—আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাস্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন —আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মত ! —পুরাণ হাকিম বদলী হ'লে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে স্কুলে নতুন

ক্লাসে উঠলে নতুম মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মুড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে চেলে, হ'লে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসাকর তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ ক'রে ন্যান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালীর বছরটি ভাল রকমেই যাক্ আর খারাপেই শেষ, হোক্ সজনেখাঁড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্‌সী উচ্চুগণ্ডকর্ত্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন !

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্চুগণ্ড করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদির ক'রে মড়াকান্না কাঁদতে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না ? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন ; কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পাল্কীগাড়ীর ছাদের উপর ব'সে চলেচেন। ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন ; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাব্‌ড়ানের বদলে ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদর বা নাক বেঁধান চলিত হলো দে'খে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকু, ঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। সবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে ক'রে টেনা ধুতি প'রে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না ; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বর্গী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে কৌশলে বেণেত বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক-একটি পাশবালিশ আচে—"যে আজ্ঞে" ও 'হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভকর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা। কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পুজার প্রতিমা পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা-টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের বারঘুরী টিনের মুহুরী দেওয়া তল্‌তাবাঁশের বাঁশী, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেচে। "ড্যানাক্, ড্যানাক, ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজচে। গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে।

একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচতে নাচতে এসেন চড়কগাছের সঙ্গো কোলাগুলি কল্লে মেয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিছেন দিকে চেয়ে রইলেন চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজদনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখচেন।

পাঠক ! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নকসার সঙ্গো কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জানলে ক্রমে আমাদের সঙ্গো যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েচে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি।"

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচরণ করলেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র জন্যই কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বইটির প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রিঃ ও প্রথম দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড 'চড়ক' এর আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ ঃ

[হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। আশমান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকোরাম বসুর ইস্ট্রীট। মূল পয়সায় দুখানা।]

প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে মধুসূদনের এই কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়েছিল—

[হে শারদে ! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে ? কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?]

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই কবিতার পরিবর্তে একটি টপ্পা গানের দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়—

"কহইটুনোয়া
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা ছিল সমকালীন সমাজ সমস্যা ও সামাজিক অবক্ষয় অবলম্বনে ব্যঙ্গামূলক নক্‌শা। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' এই ধারার সূত্রপাত এবং পরবর্তীকালে এই ধারায় পাওয়া গেছে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবুবিলাস' (১৯২৫), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) মুধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'রও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। লক্ষণীয় কালীপ্রসন্নই কেবল গ্রন্থনামে প্রথম সচেতন ভাবে 'নকশা' কথাটি ব্যবহার করেছেন ও ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর ব্যঙ্গারচনাকে প্রকৃত নকশাধর্মী করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত ব্যঙ্গারচনাগুলির মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' ছাড়া সবগুলিতেই সুনির্দিষ্ট কাহিনী আছে এবং নকশাধর্মিতার চেয়ে উপাখ্যান ধর্মিতাই প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই কালীপ্রসন্ন নতুন আঙ্গিক প্রবর্তনের দাবী করে লিখেছেন—"...আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নূতন বলে দাঁড়ালেম.... ।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'য় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার সমাজজীবনকে রঙ্গো ব্যঙ্গো, চিত্রণ নৈপুণ্যে ও বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্রুপের চাবুক দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের সকল কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতি ও হীনতার উপর আঘাত হেনেছিলেন। ভবাণীচরণ, প্যাঁরীচাঁদ, রামনারায়ণ বা মধুসূদনের সমাজের প্রতি ব্যঙ্গাবিদ্রুপ এমন ব্যাপক ও সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চরণশীল হতে পারেনি। হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া অবতার, মোসাহেব পরিবৃত-জমিদার, মাতাল, উমেদার, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণবাবাজী, ভিখারী, কেরানী, দোকানী, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, কবি, হাফ আখড়াইয়ের আসল, শ্যাম্পেনের মজলিস, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী—লেখকের দৃষ্টি সর্বত্র পতিত হয়েছে। তৎকালীন কলকাতার সমাজজীবন যেন ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতায় এখানে বিধৃত হয়েছে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পরস্পর বিরোধী আঘাতে

সেদিনকার সমাজ হয়েছিল তরঙ্গিত, আর সেই তরঙ্গের তলায় তলায় ছিল যাবতীয় কপটতা ও ভণ্ডামী—যা হুমোদের বিদ্রুপের কশাঘাতে হয়েছিল জর্জরিত। তিনি বিশেষ কোনো গল্পে আবদ্ধ না থেকে সমাজের যেখানেই অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখেছেন, সেকানেই রঙ্গব্যঙ্গামুখর ছবি এঁকেছেন। এখানে লেখক সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে সমাজচেতনা ও সমাজচিত্রের বিচিত্র প্রদর্শনী করেছেন। একথা স্বীকার করেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বাঙ্গালাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হুতোমপ্যাঁচার ন্যায় লেখকের প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক। পুরানো দিনের কলকাতার ছবি তুলে ধারা এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক রসটুকু 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র স্থায়ী মূল্য।

তবে ঐতিহাসিক রস ছাড়াও এর হাস্যরস গ্রন্থটির স্থায়ীমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই লেখক 'স্বভাবের সুনির্মল পটে'ই শুধু চিত্রাঙ্কন করেননি, তাকে রহস্যরসের রঙ্গেও রাঙিয়ে তুলেছেন। তাঁর সামাজিক বিকৃতি ও দূষিত ক্ষত সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও তিনি নীতির বেত্রদণ্ড হাতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকলেও আজ তা সাময়িকতার সীমা পেরিয়ে এসেছে বলেই হাস্যরসটুকুই এখন প্রধান উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ব্যক্তিরা প্রায়শঃই তাদের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এই কৌশল কালীপ্রসন্নই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। হয়তো তিনি পূর্ববর্তী প্যারীচাঁদ, ভবানীচরণদের সঙ্গে সুইফ্‌ট, ডিকেন্স, এডিসনের ব্যঙ্গ সাহিত্যের সমন্বয়ে এই কৌশল করায়ত্ব করেছিলেন। এভাবেই তিনি মধ্যযুগীয় অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামির পর্দা থেকে উন্নীত করেছিলেন তাঁর নক্‌শাকে। তাঁর নকশায় কিছু হিউমার ও ফান থাকলেও উইট ও স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন কপট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হাস্যকর অসঙ্গতি বা বিকৃতি হুতোমের সচেতন মনের শ্রেষ্ঠত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত অব্যর্থ ব্যঙ্গবিদ্রুপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাঁর হাসি "প্রস্ফুটিত রক্ত গোলাপের জ্বলন্ত বুদবুদের মতো, কঠিন বৃন্তে বিধৃত এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় সুরক্ষিত" (বাঙলা সাহিত্যের নরনারী—প্রমথনাথ বিশী)। তিনি শুধু হাসির আঘাতে অপরকে বিব্রত করেননি, নিজেকেও অনেক সময়ে সেই ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করেছেন। স্যাটায়ারের সঙ্গে ফান মিশিয়ে হজরতকে লন্ডনে পাঠিয়ে এবং কালী ও কেষ্টর মধ্যে কে বড় ময়ূরের লেজ ধরে তার হিসাব করে হুতোম এবং বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। হুতোমের নক্‌শায় হিউমার কম থাকলেও তা যে একেবারে নেই তা নয়।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর ভাষা। কালীপ্রসন্ন এবং প্যারীচাঁদ সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ অবশ্য সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিতরীতি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নক্‌শার শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের চলিতরূপ প্রয়োগে, বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, বানান পদ্ধতিতে চলিত ভাষা তার স্বকীয় স্বভাবের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল। হুতোমী ভাষায় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

১। *কলকাতার চলতি মুখের বুলি (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি বিদেশি শব্দ) এবং বাংলার নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচনের প্রাধান্য।*

২। *শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও সর্বনাম পদের চলিতরূপের ব্যবহার।*

৩। *শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।*

৪। *চলিত রীতির আধারে ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্তি।*

৫। *বর্ণনায় বিষয়ের নিপুণ চিত্রধর্মিতা।*

৬। *বাক্যগঠনরীতি কথনভঙ্গিমায় স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণের প্রবাহে গতিময় ও চঞ্চল।*

কি শাণিত ব্যঙ্গারচনায়, কি কৌতুক তরল পরিহাস রসিকতায় এবং গভীর গভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমী ভাষার আশ্চর্য সাবলীলতা ও সজীবতা দেখে এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর প্রশংসা করেছিলেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের চলিত ভাষার সমালোচনায় কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে বিবেকানন্দ ছিলেন এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও সাধু চলিতের দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত চলিতের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সংস্কৃত ঘোমটা খুলে আমাদের ভাষাবধূটির কালো চোখের চাহনি দেখার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিবেকানন্দেরও পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন।

আবার শুধু ভাষা নয়, নূতন ছন্দের দিক থেকেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে 'নক্‌শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন যে দুটি কবিতা রচনা করেন তাতেই পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চিহ্নিত বাংলা ছন্দের প্রথম সূচনা হয়। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশচন্দ্র একথা গোপন রাখেন নি। (গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধ' নাটকের title page)।

বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'অশ্লীল,' বিদ্যালাগর তাকেই বলেছেন 'বড়ই আবশ্যক'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান আপত্তি ছিল অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে, কিন্তু এই তথাকথিত অশ্লীলতা গ্রন্থটির সামান্য অংশেই আছে, সমগ্র গ্রন্থ সম্পর্কে এ অভিযোগ তাই প্রযোজ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নীতির দোহাই দিয়ে অশ্লীল বলেছেন, আধুনিক পাঠকের কাছে তা অশ্লীল নয়, কারণ তা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাই। তাছাড়া হুতোম সমাজের বিকৃতি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর নকশা এঁকেছিলেন, তাই পিউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি। দু-একটি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে ওঠে না। যেমন "কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন" (কলিকাতার চড়ক পার্বন)-বাক্যটিকে সার্বিকভাবে অশ্লীল বলা চলে না। এই প্রবন্ধে মোট শব্দসংখ্যা ৩৯০০ আর বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দ সংখ্যা-৫। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে "পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত" বলেও নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি পরিচয়ের সাধারণীকৃতিত্বে হুতোমরে নক্‌শা সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তাছাড়া ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও (মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত) ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপাদান ছিল। প্রকৃতপক্ষে হুতোম নিজে ছিলেন উদার, প্রগতিবাদী ও পরোপকারী, তাই সমাজের দুনীর্তিগ্রস্ত অধঃপতনের উপর তাঁর মর্মভেদী আঘাত এমন অভ্যর্থভাবে এসে পড়েছিল তাই নীতিবাগীশ শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছেও হুতোমের নক্‌শা সুনীতি ও সুরুচির বিরোধী মনে হয়নি, বরং মনে হয়েছিল "সরল, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী"। হুতোমের পূর্বে বা পরে সমাজের এমন সর্বত্রসঞ্চারী ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাধর্মী নক্‌শা আর কারো কলমেই ফুটে ওঠে নি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা রচনার নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি সমাজচেতনা, হাস্যরসসৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক চলিতভাষার সাহিত্যে প্রবর্তন, বিষয় বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতা ও সরসতার অপূর্ব সমন্বয়ে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আর কয়েকজন প্রখ্যাত হাস্যরসিকের রচনারীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে জরুরী। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচারনক্‌শা'-র মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও গ্রন্থদুটি সগোত্র প্রায়। কারণ প্যারীচাঁদ সাধুগদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দের মিশ্রণে জিকেন্সের 'পিক্‌উইক পেপাস' এর মতো চিত্রধর্মী ব্যঙ্গোপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন। আর কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ কথ্যভাষায়, রঙ্গব্যঙ্গের শাণিত সুচতুর বৈঠকিভঙ্গিতে ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এর মতো নক্‌শাই লিখেছিলেন। বরং হুতোমের নক্‌শার উপর মধুসূদনের প্রহসন দুটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ['একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)]। পরবর্তী দীনবন্ধু মিত্রের 'বিধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)

ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনগুলিতে হুতোমের মতই ব্যক্তিগত পটভূমিকায় হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস আছে। তবে হুতোমের নক্‌শায় ব্যঙ্গাতীক্ষ্ণ উইট এবং স্যাটায়ারই বেশি আর সহানুভূতিসম্পন্ন দীনবন্ধুর প্রহসনে হিউমারের করুণ হাস্যরস বেশি। বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর পূর্বাভাষ পাওয়া যায়' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে'। হুতোম এবং কমলাকান্ত উভয়েই নিজ নিজ স্টাইলে অর্থাৎ হুতোম স্যাটায়ারের মাধ্যমে এবং কমলাকান্ত হিউমারের মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় রেখে গেছেন। হুতোমের ব্যঙ্গোর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গোর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে বিদ্যাসাগরের বেনামী ব্যঙ্গ পুস্তিকার ব্যঙ্গ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রীর তর্কযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে অনেকটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ, কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ কখনো ব্যক্তিগত পটভূমিকায় বিধৃত হলেও প্রায়শঃই তা ব্যক্তিচরিত্রের সীমা পেরিয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক রূপে সামাজিক বিদ্রুপে পরিণত হয়েছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী হুতোমের প্রধান সাদৃশ্য হল উভয়ের রচনাতেই ব্যঙ্গোর ঝাঁঝ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু প্রধান পার্থক্য হল হুতোম পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বারা আর ইন্দ্রনাথ পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ রক্ষণশীল মনোভাবে দ্বারা। ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব কাহিনীতে উদ্ভটত্ব কম, কিন্তু শ্লেষ ও বিদ্রুপের আঘাতে এখানে সমাজের ভণ্ডামি প্রভৃতি অনাবৃত হয়ে পড়েছে এবং এখানেই পূর্বজ হুতোমের স্যাটায়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য ও সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক গ্রন্থে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের কথ্যরূপ সমন্বিত, দেশি-বিদেশি সর্বাধিক শব্দের স্বীকরণযুক্ত, হুতোমী ভাষার মত তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন খাঁটি চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী বীরবলের সঙ্গে হুতোমের সর্বপ্রধান সাদৃশ্য হল উভয়েই চতুর, বুদ্ধিদীপ্ত, নাগরিক শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে তার আবেগব্যাকুল করুণ রসার্দ্র আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে উভয়ের লক্ষণীয় পার্থক্য হল হুতোমে কিছু অশ্লীল শব্দের ব্যবহার থাকলেও বীরবলে তা একেবারে নেই। তাছাড়া হুতোমের তুলনায় বীরবলে উইটের অনেক বেশি প্রাধান্য। শেষকথায় বলা চলে ভাবী ফরাসি সাহিত্যিক, মোপাঁসার মেজাজ নিয়ে, ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এক নক্‌শাধর্মী আধারে উনিশ শতকীয় নাগরিক বাঙালী সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুরো খাঁটি চলিত ভাষায় চিত্র ও চরিত্রের রঙ্গব্যঙ্গময় নিপুণ প্রদর্শনীতে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৪৫.৫ সারাংশ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বইটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজের নানা সমস্যা এবং সামাজিক বিকৃতি নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকীয় কলকাতার সামাজিক জীবনের নানা কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতির ছবি গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। লেখকের দৃষ্টি মাতাল, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণব বাবাজী, ভিখারি, কেরানি, দোকানি, স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্ক, মোসাহেব পরিবৃত জমিদার, এছাড়া নানা ধরনের উৎসব যেমন চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, হাফ আখড়াইয়ের আসর, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী ইত্যাদি সবদিকেই পড়েছে।

গ্রন্থটির মধ্যে ঐতিহাসিক রসের পাশাপাশি হাস্যরসের অবতারণাও লক্ষ্য করা যায়। হাস্যরসের প্রকারভেদের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর রচনা উইট এবং স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভাষা। গ্রন্থটির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাষাকে স্বয়ং বিদ্যাসাগরও প্রশংসা করেছিলেন। ভাষার পাশাপাশি গ্রন্থের মধ্যে ছন্দের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ছন্দর পরবর্তীকালে "গৈরিশ ছন্দ" নামে চিহ্নিত হয়।

"হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থটির সঙ্গে মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী", 'বিয়ে পাগলা বুড়ো" "জামাই বারিক" ইত্যাদি প্রহসনগুলির হাস্যরসের সৃষ্টির

মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মুচিরাম গুড়ের জীবনাচরিত"-এর সঙ্গেও গ্রন্থটির "বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে"-র মিল পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, বীরবল প্রমুখ লেখকের লেখার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহেবর লেখনভঙ্গির মিল পাওয়া যায়।

৪৫.৬ অনুশীলনী

১। "হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা"-র চড়ক নিবন্ধ অবলম্বনে লেখকের সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিন।

২। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভিতরে যে সমাজসংস্কারক মন, হাস্যরসিক প্রাণ ও চিন্তাশীল মনন ছিল—তার পরিচয় পাঠ্য নিবন্ধ অনুসারে দিন।

৩। পাঠ্য 'চড়ক' নিবন্ধে গৃহীত কালীপ্রসন্নের ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

খ. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" কেন বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ?

২। 'চড়ক' নিবন্ধে ব্যবহৃত অশ্লীল শব্দের পাঠান্তে আপনি নিবন্ধটিকে কী অশ্লীল বলবেন ? আপনার মতের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৩। কালীপ্রসন্নের মেজাজ পরবর্তীকালে কার রচনায় লক্ষ্য করা যায় ?

৪। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার লেখা ? এই গ্রন্থটি কি ধরনের ?

৫। কালীপ্রসন্নের ব্যবহৃত কলকাতার চলতি মুখের বুলির উদাহরণ দিন।

৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ
"একেই কি বলে সভ্যতা" গ্রন্থের রচয়িতা—
(ক) মধুসূদন দত্ত, (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৪৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২-য় খণ্ড।

২। মন্মথ নাথ ঘোষ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৩। অজিত দত্ত—বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—"হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা"-র ভূমিকা অংশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৬। ড. সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ।

৭। ড. অজিতকুমার ঘোষ—বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা।

৮। পরেশচন্দ্র দাস—বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ।